ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 2005-2012
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.425

নারীমুক্তি আন্দোলন: ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর সমাজসংস্কারক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে (১৮০১-১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ)

ড. অন্তরা চৌধুরী, *সহকারী অধ্যাপিকা, নেতাজী শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.03.2026; Accepted: 21.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Since 1914, March 8th has been recognized as International Women's Day, commemorating the movement of working-class women in New York in 1910. However, while this pertains to the international sphere, what was the nature of this women's emancipation movement within India—specifically in Bengal? To understand this, we must examine the nineteenth century. The nineteenth century marked a pivotal turning point in Bengali society and literature. During the eighteenth century, the British, having initially arrived with their wares for trade, gradually consolidated their political authority. Following the Battle of Plassey (1757) and subsequently the Battle of Buxar (1764), the British embarked on their administrative journey by securing the rights to collect revenue from Bengal, Bihar, and Odissa. Yet, at that juncture, the light of Western civilization had not yet begun to cast its influence upon Indian civilization. In the early nineteenth century, for the sake of administrative convenience—specifically to cultivate a class of indigenous clerks—a select group of Indians gained access to Western education. When this new generation of Western-educated youth analyzed their own society through a lens free of traditional prejudices, they were deeply distressed by the deplorable condition of Indian women. They realized that societal progress could only be achieved if the advancement of the larger segment of society—namely, its women—was made possible. Consequently, the emancipation of women became the central pillar of the social reform movements spearheaded by these newly educated youths. Although they encountered numerous obstacles on this path, they never faltered; and thus, under their leadership, a powerful wave of women's emancipation swept across the entire nineteenth century.

Keywords: Women, Liberation, Society, Literature, Education, Rituals, Boundaries, Reformation, Freedom

ঊনিশ শতকে নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রেক্ষাপট কী কারণে সৃষ্টি হল সেটি প্রথমে দেখে নেওয়া যাক্। হিন্দু ভাবধারায় অর্ধনারীশ্বরের চির প্রতিষ্ঠা রয়েছে। অর্ধনারীশ্বরের পরিকল্পনাতেই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে নারী পুরুষ একে অপরের পরিপূরক এবং তাদের সম্মিলনেই সম্পূর্ণতা সম্ভব। কিন্তু এই ভাবধারা ভারতের জলবায়ুতে থাকলেও এখানে নারীরাই সর্বাধিক অবদমিত হয়েছে। এই অবদমনের মধ্যেও প্রাচীনযুগে তাদের

শিক্ষা তথা সংস্কৃতিক কাজে হস্তক্ষেপ করার স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু এই পরিস্থিতির পরিবর্তন হল। মুসলিম আক্রমণের (১২০১-০৩খ্রীঃ) পর বাংলার জনজীবনের বিপুল পরিবর্তন ঘটল। হিন্দুরা বিধ্বংসী মুসলিমদের হাত থেকে নিজেদের সম্পদরূপী নারী প্রজাতিকে রক্ষা করার জন্য রক্ষণশীলতার পরিমাণ বৃদ্ধি করল। ফলে নারীদের যেটুকু স্বাধীনতা ছিল তা বিলুপ্ত হল। সেনযুগে (১০ম-১২শ খ্রীষ্টাব্দ) যে কৌলীন্য প্রথা প্রতিষ্ঠিত ছিল তা মধ্যযুগে আরো চরম দুর্দশায় পর্যবসিত হল। সে যুগের বারোমাস্যাগুলিতে বাঙালী রমণীদের বারোমাসের দুঃখের চিত্র আমাদের সম্মুখে খুব স্পষ্ট রূপে প্রকাশিত হয়। তারপর এল যুগ পরিবর্তনের আরেক নতুন অধ্যায় ইংরেজদের হাত ধরে। পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে সমাজের চিত্র পরিবর্তিত হল, আর এই পরিবর্তন ঘটল নারীর অবস্থার উন্নতিকরণের মাধ্যমে। সমাজ সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে যে যে বিষয়গুলি আমরা প্রত্যক্ষ করি, তার বেশীরভাগই নারী মুক্তি আন্দোলন-

(১) সতীদাহ প্রথা রদ করা
(২) বিধবা বিবাহ প্রচলন করা
(৩) স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন করা
(৪) বহুবিবাহ রদ করা
(৫) বাল্যবিবাহ রদ করা

প্রথমে আলোচনা করা যাক্ সতীদাহ প্রথা প্রসঙ্গে। পতির মৃত্যুর পর স্বামীর চিতায় স্ত্রীর সহমৃতা হওয়ার ভয়ঙ্কর প্রথার নাম সহমরণ বা সতীদাহ প্রথা। রামায়ণ, মহাভারত থেকে শুরু করে বহু অর্বাচীন পুরাণে সতীদাহ প্রথার সমর্থন করা হয়েছে। ধর্মের নামে মেয়েদের পুড়িয়ে মেরে ফেলার ইতিহাস শুধু ভারতেই নয় ইউরোপ থেকে শুরু করে বিশ্বের সর্বত্রই কম বেশী ছিল। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সেগুলি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু ভারতে তা আধুনিক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কলকাতা শহর তখন ভারতের রাজধানী। পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার শুরু হয়ে গেছে। সেই কলকাতা শহরেই সরকারী হিসেব অনুযায়ী সতীদাহের সংখ্যা ছিল–

স্থান	১৮১৫	১৮১৬	১৮১৭	১৮১৮	মোট সংখ্যা
কলিকাতা	২৫৩	২৮৯	৪৪২	৫৪৪	১৫২৮

(বাগল: পৃ. ২৭)

এই রকম পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে রাজা রামমোহন এই ভয়ঙ্কর প্রথাকে রদ করার চেষ্টা শুরু করলেন। তবে অমানবিক এই প্রথাকে রদের চেষ্টা এর পূর্বেও অনেকে করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সম্রাট আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রীঃ)। তিনি এক শ্রেণীল কর্মচারীও নিয়োগ করেছিলেন– "In every city and district vigilant and truthful inspectors were appointed to distinguish between voluntary and forced 'sati' and the prevent the latter" [Fazal: P-42] এছাড়া আরো কিছু মোগল সম্রাট থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে ডিরোজিও এবং তার অনুগামীরা এই প্রথা বন্ধ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু রামমোহন এবং তাকে সমর্থনকারী তৎকালীন গভর্নর জেনারেল এই প্রথাটিকে স্বমূলে ধ্বংস করতে পেরেছিলেন। ১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর আইন করে এই প্রথাটি বন্ধ করার কথা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এর বিরুদ্ধেও প্রতিবাদের ঝড় তোলেন

> "...রাজা রাধাকানত দেব, 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকার সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'ধর্মসভা'র পক্ষের বারো জন সদস্য– গোপী মোহনদেব, মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, নীলমণি দেব, গোকুল নাথ মল্লিক, ভবানী চরণ মিত্র, রামগোপাল মল্লিক, নিমাই চাঁদ শিরোমণি, হরনাথ তর্কভূষণ প্রভৃতি ব্যক্তি" (সিংহ: ২০০০: পৃ. ১৪৯)।

এই সমস্ত বাধাবিপত্তির মধ্যেও রামমোহন রায় কখনও পিছিয়ে আসেননি। তিনি সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে শুধু ভারতে নয় সুদূর ইংল্যান্ডেও বিপুল জনমত তৈরী করেন। তাই অচিরেই এই প্রথাটি বিলুপ্ত হল।

এতক্ষণ আমরা সতীদাহ প্রথাকে ঘিরে ইতিহাসের দিকটি জানলাম, কিন্তু বাস্তবিক মেয়েরা এই বিষয়টিকে কীভাবে দেখতো তার পরিচয় আমরা বিভিন্ন সাহিত্য নিদর্শনে পাই। সতীদাহ প্রথাকে এতদিন টিকিয়ে রাখার পেছনে কারণ ছিল- বিধবা রমণীকে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। এছাড়াও বিধবা রমণীর ভরণপোষণের দায়িত্ব নেওয়া অন্যদের পক্ষে অসম্ভব তাই তাদের পুড়িয়ে মারা হতো। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর প্রথা চালিয়ে যাওয়ার পেছনে শুধু সুবিধাবাদী পুরুষরাই ইন্ধন জোগায়নি মেয়েদের মধ্যে কিছু অংশেরও এই প্রথার প্রতি সমর্থন ছিল।

প্রথমত, রমণীকুল চিরসাথী স্বামীর বিরহে আত্মবিসর্জন করতেন সতীদাহ প্রথার মাধ্যমে। প্রেমের এই শাশ্বত বাণীর জয়গানই যেন এক অর্থে এই প্রথাটি বহন করে। তাই মধুসূদন দত্ত রচিত 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে প্রমীলার মেঘনাদের চিতায় আরোহনের দৃশতে শুধু করুণাই প্রকাশিত হয়, সতীদাহের ভয়ঙ্করতা কোথায় যেন হারিয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত, ভারতে সতী, সাবিত্রীর মহান আদর্শ বর্তমান। নিজেকে সেই সম্মানের পদে উন্নীত করার আকাঙ্খা মেয়েদের মধ্যে সঞ্চারিত করা হতো। ব্যক্তিগত জীবনের চির অপমানের অবসান ঘটাতে চাইতো, মৃত্যু পরবর্তী সম্মানের আশায়। যেমন- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'মৃণালিনী' উপন্যাসের মনোরমা সকলের নিষেধ উপেক্ষা করে সহমৃতা হয়েছেন।

তৃতীয়ত, সহমরণে বিশ্বাসী হিন্দু রমণীদের কাছে এটি মহান ব্রত। তারা রমনীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার দৃশ্যটিকে দেবী দর্শনের মতোই মহান মনে করত। ক্ষমতার যে স্তরে শোষিতরা নিজেদের অজান্তে শোষকের অনুরূপ আচরণ করে তাকে আন্তোনিও গ্রামশি 'হেজিমনি' বলেছেন। তৎকালীন মেয়েরা হেজিমনি অবস্থার শিকার ছিল। এই অবস্থার উল্লেযোগ্য উদাহরণ রয়েছে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'বেণু ও বীণা' কাব্যগ্রন্থে 'সহমরণ' নামক কবিতায়, যে কবিতায় বৃদ্ধ স্বামীর চিতায় আরোহণকারিণী রমণীর যন্ত্রণায় আর্তনাদকে ঢাকার আয়োজনের উল্লেখ আছে–

"... ভাঙ্গল সুখের হাট;
খয়ের রাশি ছড়িয়ে পথে
চলল নিয়ে শবের সাথে,
যেখায় শ্মশান ঘাট।
... বাজল শতেক শাঁখ;
লোকের ভিড়ে ভরেছে ঘাট –
ধোঁয়ায় চিতার আধ ভিজা কাট,
উঠল গর্জে ঢাক।"

সতীদাহ প্রথা যেকোন সমাজের কলঙ্ক স্বরূপ। সমাজের এই দগ্‌দগে ক্ষতটি নিবারণ করার চেষ্টায় যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রণী হলেন রামমোহন রায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রথম সাফল্য হিসেবেও এটিকে ধরা যেতে পারে।

বিধবাবিবাহ আন্দোলনের পুরোধা পুরুষ ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। প্রচীনযুগে বিধবা বিবাহের প্রচলন থাকলেও তা মধ্যযুগে অবলুপ্ত হয়ে যায়, বিশেষত কুলীনকুলের রমণীদের ক্ষেত্রে। এছাড়াও কৌলীন্য প্রথার

কারণে কোন কোন পুরষ শতাধিক নারীকে বিবাহ করতো এবং সেই স্বামীটির মৃত্যু ঘটলে তাদের সকলকে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হতো। আর এই বিধবাদের মধ্যে বেশীর ভাগেরই শৈশব অবস্থা কাটেনি। হিন্দু নারীদের এই অসীম দুঃখের অবস্থকে দূরীভূত করার জন্য বিদ্যাসাগর সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের সপক্ষে জনমতের পাশাপাশি শাস্ত্রীয় যুক্তিও তুলে ধরলেন –

"গতে মৃত প্রবৃজিতে ক্লীবে চ পতিতে পাতৌ।
পঞ্চ স্বাপৎসু নারীণাং পতবণ্যে বিধয়তে।।" (পরাশর সংহিতা: চতুর্থ অধ্যায়)

অর্থাৎ পাঁচটি ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের পুনর্বিবাহ শাস্ত্রবিহিত, তা হল– স্বাশী অনুদ্দেশ হলে, মারা গেলে, ক্লীব বলে গণ্য হলে, সংসার ধর্ম ত্যাগ করলে কিংবা পতিত হলে।

বিদ্যাসাগরের এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিস্তর ঝড় উঠেছিল। ব্রজসুন্দর মত্রি (১৮২০-৭৫), কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮২), শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪০-১৯২৫), দুর্গামোহন দাস (১৮৪১-৯৭), শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) প্রমুখ ব্যক্তিদের বিধবাবিবাহ সমর্থন করার জন্য নানা লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়। বিদ্যাসাগরের জীবনীকার বলেছেন বিধবাবিবাহ আন্দোলনের ফলে 'হিন্দু গৃহে সত্যই একটা বিস্ময় বিভীষিকার সৃস্টি হল।' (সরকার: ১৯২২: পৃ. ২৯৬) তাই এর প্রতিক্রিয়া বিকট আকার ধারণ করল। যারা বিধবাবিবাহের সমর্থন করলেন তাদের নানাভাবে ব্যঙ্গ বিদ্রুপের মাধ্যমে জর্জরিত করা হত। তবে এত কিছু বাধাবিপত্তি পেরিয়ে ১৮৫৬-র জুলাই মাসে বিধবাবিবাহের আইনটি স্বীকৃতি পায়। কিন্তু এত কিছুর পরেও বিধবাবিবাহ সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করেনি। এমনকি এই পরিস্থিতির পরিবর্তন একবিংশ শতাব্দীতেও সর্বত্র ঘটতে পারেনি। তবে তৎকালীন ভয়ঙ্করতার মাত্রাটি বর্তমানে অনেকটাই প্রশমিত হয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে কিছু শিক্ষিত সম্প্রদায় ছাড়া বিধবাবিবাহের সমর্থন করতে কেউ সাহস পায়নি। এর কারণ বিশেষত সমাজের রক্ষণশীলদের ভয়ে, তাই বহু মানুষ বিধবা কন্যার দ্বিতীয় বিবাহের কথা ভাবলেও তা বাস্তবায়িত করতে পারেননি। রমণীকুল এ বিষয়টিকে কীরূপে দেখতো সেটার একটা পরিচয় পাওয়া যায় 'নীলদর্পন' নাটকের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে –

"আদুরী। সেই সাগর নাড়ের বিয়ে দেয়, ছ্যা– নাকি দুটো দল হয়েছে। মুই আজাদের দলে।"
(মিত্র: ২০০৫: পৃ. ৮১)

আদুরী নিম্নশ্রেণীর মেয়ে। তার বক্তব্য অনুযায়ী বোঝা যাচ্ছে নিম্নশ্রেণীর মানুষদের মধ্যেও বিদ্যাসাগর সমালোচিত হয়েছেন। বিধবাবিবাহের সমর্থনে বাংলার রঙ্গমঞ্চে বহু নাটক অভিনীত হয়েছে। কিন্তু সর্বাধিক মঞ্চ সাফল্য লাভ করে বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে লেখা নাটকগুলি। প্রসঙ্গত, বঙ্গিমচন্দ্রের এ বিষয়ে অবস্থানটি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে বিধবাবিবাহ তৎকালীন সমাজের লোকাচার বিরুদ্ধ, তাই এটিকে স্বীকৃতি দেওয়ার সময় আসেনি। এমনকি তিনি 'বিষবৃক্ষ' এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাস দুটিতে এমন বিধবা রমণীর প্রেম দেখালেন যেখানে তারা অন্যের সুখের সংসার ভাঙার মূল কারণ। তাই কুন্দনন্দিনীকে আত্মহত্যা করে এবং রোহিনীকে গোবিন্দলাল হত্যা করে সমাজের স্থিতাবস্থা বজায় রেখেছে। তাদের মৃত্যুতে উপন্যাসে করুনরস সঞ্চারিত হলেও তাতে বিধবা বিবাহের সমর্থন দেখা যায় না। বরং তারা প্রবৃত্তিগত তাড়নাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল বলেই তাদের মৃত্যু হয়েছে। স্বভাবতই বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সমর্থক হিসেবে এই উপন্যাস দুটিকে বলা যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর আর একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল তৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৪৭-১৯১৯)। 'কঙ্কাবতী', এটিতে বিধবাবিবাহ সাধারণ শ্রমিক শ্রেণীর কাছেও কতটা ঘৃণ্য সেটি তুলে ধরা হয়। এখানে আরেকটি বিষয় দেখ যায় যে 'তনু রায়' স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বিধবা বিবাহকে সমর্থন করেছিল। তৎকালে বহু

যুবক অর্থের লোভে বিধবা বিবাহ করতেন। বিধবাকে বিবাহ দানের উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগর নিজের অর্থ ব্যয় করেছিলেন।

যাইহোক, বিধবা বিবাহ প্রচলিত করার জন্য বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত চেষ্টা এবং সে বিষয়ের সাফল্য– এ সবই বাংলা তথা ভারতের কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষের বহু রমণীর কাছে এটি আশীর্বাদ স্বরূপ ছিল।

ভারতের সমাজে জগদ্দল পাথরের মতো বসে আছে কৌলীন্য প্রথা। কৌলীন্য প্রথারই ফল বহুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহ। বল্লাল সেনের প্রচলিত কৌলীন্য প্রথায় কুলীন পুরুষ একাধিক রমণীকে বিবাহ করত। কন্যার পিতারাও এই বিবাহ দিতে দ্বিধা করতো না। কারণ এটি না করলে সমাজ তাকে একঘরে করে দেবে। আর এই প্রথার অব্যবহিত ফল হল বাল্যবিবাহ।

বিদ্যাসাগর গ্রামে গ্রামে ঘুরে কুলীন ব্রাহ্মণদের বিবাহের সংখ্যার যে চিত্র ধরে ছিলেন তা সত্যই বিস্ময়কর। বহুবিবাহ রদ করার জন্য তিনি আইন প্রণয়ণের চেষ্টা করেন এবং তৎকালীন সরকারকে তাঁর মতের পক্ষে নিয়ে আসতে সফল হন। তৎকালীন লেফটেনান্ট গভর্নরের পত্র থেকে এই মতের সপক্ষে যুক্তি পাওা যায়,

> "I have taken a deep interest in the question since it was first seriously agitated by our late lamented friend Vidyasagar for enactment there upon saw the Maharaj of petitions on the subject had been presented to the legislative council. Sir John Grant promised very shortly to introduce a Bill for the abolition of Hindu Polygamy." (মিত্র: ১৯৬৯: পৃ. ৩৪০)

বহুবিবাহের খারাপ দিক নিয়ে সকলেই সমালোচনা করেছেন। কিন্তু বিশিষ্ট জনেরা এটিকে আইন করে বন্ধ করতে চাইলেন না। তাঁদের মত ছিল সমাজ পরিবর্তনের স্বাভাবিক গতির সঙ্গে এটিও অবলুপ্ত হয়ে যাবে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারই একে অবলুপ্ত করবে। এছাড়াও সিপাহী বিদ্রোহের পর সরকার পক্ষও ভারতবাসীকে কোনভাবে ক্রুদ্ধ করতে চায়নি। ফলত আইন করে বহুবিবাহ রদ করা সম্ভব হয়নি। তবে শুধু ঊনবিংশ শতাব্দী কেন মধ্যযুরে সাহিত্যেও বহুবিবাহের সমালোচনা করা হয়েছে। স্বপত্নীদের সহবাসে নারীদের মর্মান্তিক বেদনার কথা কবিতা, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ সর্বত্র বর্ণিত হয়েছে। ঊনবিংশ শতকের বিখ্যাত নাটক 'কুলীন কুলসর্বস্ব' বহুবিবাহকে সমালোচনা করে লেখা। ঊনিশ শতকের সাহিত্যের প্রসঙ্গ আসলে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা। তাঁর একাধিক উপন্যাসে বহুবিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন– বিষবৃক্ষ, দেবী চৌধুরাণী, কপালকুন্ডলা, সীতারাম এই সমস্ত উপন্যাসে বহুবিবাহ এবং তার ফলে নারীদের মানসিক অবসাদের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকক্ষেত্রে তিনি বহুবিবাহের সমালোচনা থেকে বিরত থেকেছেন। মেযন– 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে সাগর ও প্রফুল্লর মধ্যে সখ্যতা দেখিয়েছেন। এক্ষেত্রে কোন ক্ষোভ জমা হয়নি। আসলে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তৎকালীন সমাজের নারীদের জীবনের বাস্তবিক রূপ তুলে ধরেছিলেন। যেখানে কোন স্ত্রীর কাছে স্বামীর পুনর্বার বিবাহ যেন এক স্বাভাবিক নিয়ম। সমাজের শোষিতরা নিজেদের দুরবস্থার কারণগুলি বুঝতে পারে না। এর পেছনে একটি বড় কারণ অশিক্ষা।

কৌলীন্য প্রথার আরেকটি ভয়াবহ দিক বাল্যবিবাহ। বাল্যবিবাহ হল নারীকুলের আরেকটি অসহায় প্রথা। বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় ১৮৬০ সালে একটি আইন প্রণয়ন করা হয়, যাতে হিন্দু বিবাহে নারীদের সর্বনিম্ন বয়স ১০ বছর ধার্য করা হয়। ১৮৯১ সালে মেয়েদের বিবাহের জন্য সর্বনিম্ন বয়স ১২ বছর স্থির করা হয়। কেশবচন্দ্র সেন, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিরা বাল্যবিবাহ আইন করে বন্ধ করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ

করেছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ মণীষীরা মনে করতেন এই প্রথাও কালের নিয়মে বন্ধ হয়ে যাবে। আইন করে এটিকে হঠাৎ বন্ধ করা অসম্ভব। শিবনাথ শাস্ত্রীর 'নয়নতারা' উপন্যাসে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হয়েছে, স্বর্ণকুমারী দেবীর 'স্নেহলতা' উপন্যাসেও বাল্যবিবাহের খারাপ দিকটি তুলে ধরা হয়। তবে এটা ঠিক যে বাল্যবিবাহের প্রবণতা ধীরে ধীরে কমে আসছিল কারণ আধুনিক পুরুষ সমাজ নিজেদের জন্য শিক্ষিত স্ত্রী চাইছিল। ফলে বালিকা বধূদের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে। বর্তমানে ভারত সরকারের নিয়ম অনুসারে নারীদের ১৮ বছরের নীচে বিবাহ করাকে দন্ডনীয় অপরাধ হিসাবে ধার্য করা হয়েছে। কিন্তু তবুও এখনও বাল্যবিবাহ ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলে খুব অল্প পরিমাণে হলেও বিদ্যমান। আসলে নারীকে বরাবরই পুরুষ জাতি নিজেদের সম্পদ বলে মনে করেছে। এই সম্পদের উপর অধিকার তারা যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি করতে চেয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্ত্রী শিক্ষা আন্দোলনটি সবদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ পূর্বোল্লিখিত আন্দোলনগুলির সার্থকতা তখনই সম্ভব যখন নারীরা নিজের মূল্য নিজেরাই উপলব্ধি করবে, শিক্ষা ছাড়া যা কোনভাবেই সম্ভব নয়। প্রাচীন ভারতে নারী শিক্ষার কোন বাধা ছিল না। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজ যতই তার ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে থাকল ততই নারীর উপর নিজেদের অধিকারকে কুক্ষিগত করতে চাইল। অশিক্ষার অন্ধকারেই এই অবস্থার সৃষ্টি হযেছে। আধুনিকতার ছোঁয়ায় এই অবস্থার পরিবর্তন হতে লাগল। অন্যান্য নারী মুক্তি আন্দোলনের মতো এই আন্দোলনেও পুরোধা পুরুষ ছিলেন বিদ্যাসাগর। তবে এর পথও দুর্গম ছিল। ১৮৪৭ সালে কালীকৃষ্ণ মিত্র ও নবীনকৃষ্ণ মিত্রের উদ্যোগে বারাসাতে প্রথম মেয়েদের স্কুল শুরু হয়, তবে এর ফলে তাঁদের যা লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। এরপর ১৮৪৯ সালের ৭ই মে ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন, ১৮৬২ সালে এর নাম হয় বেথুন স্কুল। বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে গ্রামে গঞ্জে একাধিক মেয়েদের বিদ্যালয় নির্মিত হয়। আবার উঠল বিরোধিতার ঝড়। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখরা দাবী করলেন স্ত্রীশিক্ষার ফল মারাত্মক। এর দ্বারা নারী জাতির বিস্তর ক্ষতির সম্ভবনা আছে এমনকি তাদের স্বাস্থ্যের এতটাই ক্ষতি হয় যে তারা সন্তান ধারণে অক্ষম হয়ে যায়। এই সমস্ত কারণে স্ত্রী শিক্ষার স্কুলগুলিতে ছাত্রী সংখ্যা কমতে থাকলো। তবে এ অবস্থারও পরিবর্তন ঘটল। বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

> "... দিনকতক ধূম পড়িল, স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার সংস্কার কর, স্ত্রীশিক্ষা দাও। বিধবার বিবাহ দাও। বহু বিবাহ নিবারণ কর, ... যে রীতিগুলির চলন আপাতত অসম্ভব, সেগুলি চলিত হইল না; স্ত্রী শিক্ষা সম্ভব এজন্য তারা এক প্রকার প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে।" (চট্টোপাধ্যায়: ১৩৪৬: পৃ. ৪১)

মোটামুটিভাবে স্ত্রীশিক্ষার একটা ক্ষীণধারা বাংলার আবহাওয়ায় শিক্ষিত যুবকদের প্রচেষ্টায় শুরু হয়ে যায়। বেথুন নবশিক্ষিতা বালিকাদের মধ্যে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়েছিলেন। ১৮৫০ সালের ২৯শে মার্চ বেথুন ডালহৌসিকে একটি চিঠিতে জানাচ্ছেন, "The eagerness of children to learn and their docility and quickness correspond fully with what we have seen of the Bengali boys and in judgment of their intelligent teachers for surpass what is found among European girls of the same age." এবার আসা যাক্ মেয়েদের স্কুলগুলিতে কি পড়ানো হতো এ প্রসঙ্গে। নারী শিক্ষার প্রাথমিক উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ হল আশুনিক শিক্ষিত পুরুষদের উপযুক্ত করে স্ত্রী জাতিকে গঠন করা। এই কারণে কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত 'মেট্রোপলিটন ফিমেল স্কুল', রন্ধন শিক্ষা পর্যন্ত পাঠক্রমের অংশ হিসেবে রাখা হয়েছিল। আসলে প্রকৃতিগত দিক দিয়ে বা শারীরিক গঠনের দিক থেকে মানুষ দু'প্রকার– নারী ও পুরুষ। এটি তাদের লিঙ্গগত পরিচয়। কিন্তু সমাজও নারী ও পুরুষের জন্য কিছু আলাদা নিয়ম নির্ধারণ করে রেখেছে। এই সামাজিক

লিঙ্গগত পরিচয় তাদের বজায় রাখতে হয়। অর্থাৎ মেয়েরা ছেলেদের মতো আচরণ করলে কিংবা বিপরীত পরিস্থিতি ঘটলে তা সমাজের কাছে দৃষ্টিকটু হয়ে ওঠে। (গুহ: কলকাতা– ৯) স্ত্রীশিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে তা পাঠক্রমে করা হল সামাজিক স্ত্রীলিঙ্গের পরিকাঠামো বজায় রেখে। তাই ১৮৭৮ সালে প্রবেশিক্ষা পরীক্ষায় পাশ করলে কাদম্বিনী ও চন্দ্রমুখী দেবীর আই.এ. পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করতে হয়। আর চিকিৎসা বিজ্ঞান জানার অধিকার যেন শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য তৈরী হয়েছে। সেই কারণেই মেয়েদের মেডিক্যাল কলেজে পড়ার অধিকার ছিল না। কাদম্বিনী দেবীকে মেডিক্যাল সায়েন্স পড়তে বহু বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কারণ পুরষদের মতো মেয়েরা চাকরী করতে যাবে না। স্বাধীনতার পূর্ব লগ্ন পর্যন্ত মোটামুটি এই ধারণাই বদ্ধমূল ছিল। দেশ বিভাগের পর যখন প্রত্যেকটি গৃহে অর্থের অভাব দেখা দিল তখনই নারীরা ব্যাপক হারে চাকরি ক্ষেত্রে নামতে পেরেছিল– "Lastly the partition of India has dealt a severe blow to the family life of several to India leaving behind their sources of income in land and properties" (Introduction : 1958; P-1) এই অবস্থায় পূর্ববঙ্গের মহিলারা যারা এ বঙ্গে উদ্‌বাস্তু হয়ে এসেছিল তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই অর্থ উপার্জনের দিকে ঝুঁকে ছিল।

সবশেষে বলা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীতেই নারীমুক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত ও বিস্তার সম্ভব হয়েছিল। নারীমুক্তি অন্দোলনের প্রধান কারণ অবশ্যই সমাজের উন্নতি সাধন, কিন্তু এর পাশাপাশি ড: রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় আরো একটি কারণের কথা বলেছেন, "ব্যক্তিগত জীবনেও অনেকে নারীর ত্যাগ তিতিক্ষা, সহনশীলতা, স্নেহবাৎসল্য, সেবাপরায়ণতা ইত্যাদি সদ্‌গুণের সান্নিধ্যে এসে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিবশত সম্ভবত এ কাজে হাত দিয়েছিলেন যা একেবারে অস্বীকার করা যায়না।" (বন্দ্যোপাধ্যায়: ১৯৯৯: পৃ. ১০) আসলে পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে, "সামাজিক কু-প্রথাগুলিকে দূরীভূত করার জন্য অভূতপূর্ব আলোড়ন জেগে উঠেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে।" (সিংহ: ২০০০: পৃ. ১৩৯) তবে সর্বোপরি এটা বলতে দ্বিধা নেই যে ঊনিশ শতকে যে নারীমুক্তি আন্দোলনের বাতাবরণ তৈরী হয়েছিল তা সর্বস্তরের নারীদের কাছে পৌঁছাতে অনেকটাই ব্যর্থ হয়েছিল। সেই ব্যর্থতার বোঝা আজও আমরা বহন করে চলেছি। তাই একবিংশ শতাব্দীতেও নারীমুক্তি যথার্থরূপে হয়নি। এই ব্যর্থতার পেছনে যতটা পুরুষ জাতি দায়ী ঠিক ততটাই নারী জাতি। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন,

> "দেশের বক্ষে মেয়েদের স্থান বটে, সেই বক্ষে তাহারা মূঢ়তার যে জগদ্দল পাথর চাপাইয়া রাখিয়াছে, সেটাকে সুদ্ধ দেশকে টানিয়া তুলিতে পারিবে কি? তুমি বলিবে সেটার কারণ অশিক্ষা। শুধু অশিক্ষা নয়, অতিমাত্রায়ায় হৃদয়ালুত।..." (ঠাকুর: ১৪১১: পৃ. ৪৯)

গ্রন্থ পঞ্জিকা:

বাংলা বই:

১। গুহ, লতিকা (ভাষান্তর), স্ত্রীলিঙ্গ (দ্য সেকেন্ড সেক্স) প্রথম খন্ড। সিমন দ্য বোভোয়ার, দীপাণ, কলকাতা -৯।

২। চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, প্রাচীনা এবং নবীনা। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র (সম্পাদক), ১৩৪৬, দি ন্যাশনাল লিটরেচার কোম্পানী, ৫, ডালহৌসি স্কোয়ার, পৃ. ৪১।

৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৪১১, পঞ্চভূত। বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ, কলকাতা, পৃ.-৪৯।

৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, রণজিৎ, ১৯৯৯, ঊনিশ শতকে নারীমুক্তি আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য (১৮৫০-১৯০০)। পুস্তক বিপনি, কলকাতা-৯, পৃ. ১০।

৫। বাগল, যোগেশচন্দ্র, বাংলার স্ত্রীশিক্ষা। বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ, পৃ.-২৭।

৬। মিত্র, ইন্দ্র, ১৯৬৯, করুণাসাগর বিদ্যাসাগর। কলকাতা, পৃ. ৮১।

৭। মিত্র, দীনবন্ধু, দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য (সম্পাদিক), ২০০৫, দেব পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ. ৩৪০ ।

৮। সরকার, বিহারীলাল, ১৯২২, বিদ্যাসাগর চতুর্থ সংস্করণ। কলকাতা, পৃ. ২৯৬ ।

৯। সিংহ, মঞ্জুশ্রী, ২০০০, ঊনবিংশ শতাব্দীর সহিত্য ও সংস্কৃতিতে বঙ্গ মহিলা। গ্রন্থ সম্পুট, কলকাতা– ৯, পৃ. ১৩৯।

ইংরাজী বই:

১। Abul Fazal, Ain-i-akbari, vol-III, p. 42.

২। Introduction, unemployment, among woman in West Bengal, Directorate of National employment service, West Bengal, 1958, ch- 1.